ময়নার গ্রাম রতনপুর

দীপক বড় পন্ডা

ময়নার খোঁজে ওর গ্রামে যাব ঠিক করেছিলাম। 'দারুণ কথা বলে। খুব উপস্থিত বুদ্ধি। আদিবাসী মেয়ে মনে হয় না।' বলেছিলেন এক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী। দারুণ মনে হল কেন জানতে চাই। কর্মীটি উৎসাহ নিয়ে বললেন, বিয়ে করেননি কেন জানতে চেয়েছিলাম ময়নাকে। ময়না তার উত্তরে বলেছে, 'কাকে বিয়ে করব? আমাদের সমাজটাকে বদলাই। তারপর বিয়ে করব'। আদিবাসী মেয়ে কেন মনে হয় না, জিজ্ঞেস করি। 'আদিবাসীরা যেমন নিজেদের গুটিয়ে রাখে, ময়না কিন্তু তেমনটা নয়। ময়না প্রচুর কথা বলে। খুব স্মার্ট।' যাই হোক ময়নার অনেক কথা এইভাবে শুনতে শুনতে গ্রামের দিকে এগোতে থাকি।

মুর্শিদাবাদ বীরভূমের সীমান্ত গ্রাম রতনপুর। চার কিমি দূরে বীরভূমের মাড়গ্রাম। পিচ রাস্তাটা জয়পুর পঞ্চায়েত অফিস ছাড়িয়ে মাড়গ্রামের দিকে এগোচ্ছে। সামনেই জয়পুর। নতুন থানা হচ্ছে ওখানে। স্বেচ্ছাসেবক কর্মীটি বললেন, 'এবার মাঠে নামতে হবে।' দূরে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'ওই গ্রামে ময়না থাকে।'

মাঠের মাঝখানে গ্রাম। চারিদিকে কোথাও কোনো রাস্তা নেই। গোধূলি বেলায় আলপথে এগিয়ে চলেছি। এক মহিলা গ্রাম থেকে আসছেন। হলুদ ছাপা শাড়ি, হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ। আল পথে দুটো মানুষ পাশাপাশি যাওয়ার জায়গা নেই। জমির শুকনো অংশে নেমে দাঁড়াই। আলাপ করার জন্য জানতে চাই, 'নাম কী?'

যার উদ্দেশে প্রশ্ন তিনি দাঁড়িয়ে যান। উত্তর আসে না। আবার জিজ্ঞেস করি, 'আপনার নাম কী?'

'লক্ষ্মী সরেন।' বহু দিনের চেনা মানুষের মতো করে বলেন, 'গ্রামে যাও সবাই আছে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'বাজারে।' উত্তর আসে।

'কখন ফিরবেন?'

'যাব আর ফিরব। দুটো মাল নেব আর চলে আসব।'

বছর পঁয়ত্রিশের লক্ষ্মী আলপথে এগিয়ে যান বড়ো রাস্তার দিকে।

গ্রামে ঢোকার মুখেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। কয়েকমাস আগে খুলেছে। 'আগে খানিক দূরে যেতে হত ছানাগুলাকে। তাই এখন গাঁয়ে স্কুল দিছে। ছেলেপুলেগুলোকে আর কষ্ট করতে হয় না।' সনতি বিসরা জমিতে ঘাস কাটতে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে বলে যান কথাগুলো। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বছর ত্রিশের এক যুবক। এগিয়ে এসেছেন। গোটা শরীরটা চাদরে মোড়া। মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কার ঘর যাবেন? বললাম, 'ময়নার ঘর।'

'ও তো ওই দিকে থাকে'।

বুঝি না কোন দিকে। যুবক বুঝতে পারেন। নিজে থেকেই বলেন, 'চলুন আপনাদের ছেড়ে আসি। অলিগলিতে আপনারা পাবেন না।' বলি, 'দরকার নেই। আপনার কাজের ক্ষতি হবে।' হাসেন। বলেন, 'কাজ আর কই। বাজার যাচ্ছিলাম, গল্প করব বলে। আপনারা এসেছেন, গল্প তো এখানেই হয়ে যাবে।' এগোতে এগোতে আলাপ হয়। নাম যোগীন্দ্র বিসরা। ময়নার প্রতিবেশী। পেশা দিনমজুরি।

বাঁশের দরজা ঠেলে যোগীন্দ্র ঢুকে পড়েন একটা ঘরে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝতে পারি না। কার ঘর। যোগীন্দ্র বলে, 'আসুন, এটাই তো ময়নার ঘর।'

ভেতরে ঢুকি। ঘরের মাঝখানে উঠোন। উঠোন লাগোয়া চাষের মাঠ। সেই উঠোনেই বাঁশের চাতাল। এক বৃদ্ধা এগিয়ে আসেন। বয়সের ভারে কোমরটা বেঁকে গেছে। হাতে ঝাঁটা। উঠোনে ঝাঁটা দিচ্ছিলেন। বললেন, 'উখানে বস।' বাঁশের চাতালটা দেখিয়েছেন।

'ময়না কই?' জানতে চাই।

'জামা গায়ে দিয়ে আসছে।' বৃদ্ধা উত্তর দেন।

চাতালে বসে রতনপুর গ্রামের চারিদিকে দেখতে পাই। উত্তরে পাতডাঙা, দক্ষিণে তেলসুন্ধি পূর্বে ঝিকটা ডাঙাপাড়া, পশ্চিমে জয়পুর। জয়পুরের এখন খুব নাম। সার্ক থেকে আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে গড়ে তুলেছে। রতনপুর এই পঞ্চায়েতেরই একটি গ্রাম।

ময়নার ঘর সুন্দর নিকানো। পরিষ্কার। উঠোনের একটা দিকে রান্না হয়। অন্য দিকে দুটো শোয়ার

ঘর। বাইরের লোক দেখে অতি উৎসাহী পড়ার কিছু ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে ভিড় করছে।

ময়নার সামনের বাড়িটায় চোখ যায়। একটি বছর চোদ্দোর মেয়ে মোবাইল ফোন উপরের দিকে করে দাঁড়িয়েছে ত্রিভঙ্গ হয়ে। এইভাবে দাঁড়িয়ে কেন, জানতে চাই। যোগীন্দ্র বলেন, 'এই এম রেডিয়োতে গন শুনছে। এই পাড়ায় ওদের শুধু মোবাইল আছে।'

ময়না আসে চাতালের সামনে। হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'এই গ্রামে আসার জন্য আপনাদের মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

বললমা, 'না, না ধন্যবাদের কী দরকার।' ময়না বলে, 'এত কষ্ট করে আমাদের দেখতে এসেছেন...।'

বলি, 'গ্রামের হালচালের কথা বলুন।' ময়না এবার কেমন চুপসে যায়। বলে 'গ্রামের হালৎ খুব খারাপ। দেখলেন তো রতনপুর গ্রামের চারিদেক রাস্তা নেই। বড়ো পাকা রাস্তা পৌঁছোতে কমপক্ষে দেড় কিমি মাঠের মাঝখান দিয়ে আলপথে যেতে হয়।'

আকাশের দিকে চোখ গেল। কিছু পাখি দল বেঁধে উড়ে চলেছে। সন্ধে নামছে। খারাপ ঝাপটা দিয়ে ফিরছে বাড়ি। গ্রামটা অন্ধকারে মুড়ে যাচ্ছে।

এই গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। একটা মাত্র কল। সেটা খারাপ হলে পুকুরের জল খেতে হয়। তেত্রিশটা পরিবার। ভোটার ছেষট্টি জন। সকলেই দিনমজুর। গ্রামের কয়েকজন ব্যাঙ্গালের গেছিলেন। কাজের সন্ধানে। ময়নাও গেছিলেন আমেদাবাদ। কেন? 'প্যাটের গতিকে। ওখানে ছবি আঁকা শিখাতাম। ভালোই ছিলাম।'

'অসুবিধা কী হল?' শুধাই ময়নাকে।

'অনেক দিন বাদে ঘর এলাম। কয়েকদিন গাঁয়ে থাকলাম। গাঁয়ের লোকের টানে ফিরে যেতে আর মন চাইলনি।' জরাজীর্ণ ম্যাক্সির ওপর গায়ে চাপানো ছোটো হয়ে যাওয়া সোয়েটারের হাত টানতে টানতে ময়না উদাস হন।

যোগীন্দ্র বলেন, 'প্রতি বাড়িতে জব কার্ড আছে। কিন্তু রতনপুরের কেউ একদিনও একশো দিনের কাজ পাননি।' একশো দিনের কাজ না পেলেও গ্রামে দিনমজুরের কাজ এঁরা পান। ডাঙাপাড়ার রাইচরণ মণ্ডল বলেছিলেন, 'এখানে আট-দশটি গ্রামের মধ্যে কেবল রতনপুরের লোকই মজুরের কাজ করে। তাই ওদের খুব চাহিদা।' এবার ঢোক গিলে ফেলেছেন, 'এখনকার লোককে বাড়িতে কাজের জন্য ডাকতে হলে দুবার আসতে হয়। আগের দিন বলে যেতে হয় আবার যেদিন দরকার সেদিন সকালে এসে ডেকে নিয়ে যেতে হয়। নইলে অন্য লোক বেশি টাকা দিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে।' ঝিটকা গ্রামের সমীর দাস এসেছিলেন। পরের দিন তাঁর সাত জন 'মুনিষ' দরকার। 'শুধু ব্যাটাছেলে। মেয়ে দরকার নেই।' পাড়ার মোড়ল সোম বিসরাকেই বলে দিয়েছেন সাতজন 'মজুরের' কথা। মোড়লকে বলে দিলেই হবে। কাল আবার আসব বলে ফিরে গিলেন। এখানে ছেলেমেয়ের মজুরি সমান। নির্দিষ্ট মজুরি ছাড়াও দিনের শেষে দিতে হয় এক সের চাল। চালের সঙ্গে দিতে হয় উলুং (লবন), বুলুং (তেল), সুলুং (লঙ্কা)। আর লাগে খাজারি জম (মুড়ি)। মজুরির হেরফের হয়। পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা। যখন যেমন চলে।

ময়নার ভালো নাম হুপনি বিসরা। 'তবে সকলে ময়নাই জানে। আসল নামটা কেউ জানে না।' ময়না হাসে।

বয়স কত জানতে চাই।

'তেত্রিশ বানাইছি।'

'বানাইছি, মানে?' কৌতুহলী হই।

লাজুক হাসে ময়না। 'কিছু মনে করবেন না। আমার অরিজিনাল বয়স পয়ত্রিশ। দু'বছর কমিয়ে রেখেছি।'

'পড়াশুনা কতদূর'?

'মাধ্যমিক পাশ।' এ পাড়ায় কেবল আমিই মাধ্যমিক পাশ ছিলাম। গত বছর আমার ভাই উকিল বিসরাও মাধ্যমিক পাশ দিয়েছে।' ময়নার গরবিনী মুখটা দেখতে পাই।

'চাকরির চেষ্টা করেননি?'

ময়না হাসে। এই হাসিতে জ্বালা আছে।

'এখন কলি যুগ। টাকা পয়সা খেয়ে অন্যদের কল ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা গরিব লোক। টাকা দিতে

পারি না। চাকরি হয় না।'

ফাঁকা মাঠটার দিকে চোখ যায়। এখন ঘন অন্ধকার। যে পাখিগুলো এই আকাশে উড়ে গেছিল খানিক আগে, তারা এখন নিজের বাসায়। হঠাৎ ময়না হাঁক পাড়ে— 'লতিকা লতিকা।'
বছর তেরো-র একটি মেয়ে দৌড়ে আসে। বলে, 'মাসি বলো।'
'মা, একটু চা কর তো এঁদের জন্য।' কিছুতেই রাজি হই না। বলি, 'লতিকার সঙ্গে বরং একটু গল্প করি। ও ছোটো মেয়ে। ওকে চা করতে হবে না।' ময়না পাড়ার একজনকে চা করার জন্য বলে। লতিকা চাতালের সামনে বসে।
'কোন ক্লাসে পড়ো?'
'ক্লাস সেভেন।'
'কোন স্কুলে?'
'জয়পুর হাই স্কুলে।'

ময়নার কাছে জানতে চাই, 'লতিকা কি আপনার বাড়িতেই থাকে?' ময়নার উত্তর আসার আগে লতিকার কাছে জানতে চাই, 'তোমার গ্রাম কোথায়?' লতিকা কিছুক্ষণ চুপ থাকে। ময়না উত্তর দেয় 'তিতলবাঁধি। বীরভূমের গ্রাম।' লতিকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'না, আমার গ্রাম রতনপুর।' ময়না বলে, 'লতিকা তুমি ঘরে যাও।' লতিকা উঠে যায় চাতাল থেকে।

ময়না কথা শুরু করে। 'বছর পনেরো আগে আমার দিদি রানির সঙ্গে তিতলিবাঁধের সনৎ মাড্ডির বিয়ে হয়। লরি ড্রাইভারি করত। ভালোই রোজগার। কিন্তু খুব নেশা ছিল। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে দিদিকে মারত। গ্রামে মিটিং হল। প্রথমে গ্রামের লোক দায়িত্ব নিয়েছিল নেশা ছাড়াবার। একবার খবর পেলাম দিদি হাসপাতালে ভরতি। এখান থেকে গেলাম আমরা। ওদের গ্রামের লোক বলল, দিদিকে যদি বাঁচাতে চাও তবে এখান থেকে নিয়ে চলে যাও। নাহলে যে-কোনো দিন মেরে ফেলবে সনৎ। তিন মাসের লতিকা আর দিদি তখন থেকেই এখানে। কয়েক মাস হল, দিদি বড়োয়াঁর একটা লোককে আবার বিয়ে করেছে। এখনকার স্বামী গরিব হলেও দিদিকে ভালোবাসে।'

চাতালের এক কোনায় অনেক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সরস্বতী বিসরা। বছর পঁচিশেক বয়স। ছয় বছর আগে বিয়ে হয়েছে এখানে। মারাংবুরু স্বনির্ভর দলের সদস্যা। দলের খাতা হবে এই আশায় এসেছেন। আমার সঙ্গী রমেশ হীরা স্বনির্ভর দলের ট্রেনার। প্রশিক্ষণ দেন স্বনির্ভর দলদের। বললাম, 'স্বনির্ভর দল করেছেন কেন?' খিলখিল করে হাসলেন। বললেন, 'নোন (লোন) পাব, সেই নোন নিয়ে গরু পুষব।'

শুধু এটাই। হতাশা চাপতে পারি না। সরস্বতী বুঝতে পারেন। বলেন 'দল করে অনেক লাভ'। উৎসুক হই। সরস্বতী বললেন, 'আমরা গরিব লোক ঘরে খুব গোলমাল করি। ঝগড়াঝাটি করি। করে ঘর ছেড়ে বাপের ঘর পালাই। রাগ কমে। ঘরে ফিরি। এসে দেখি, ঘর ভেঙে গেছে।'

সরস্বতী দম নেন। এবার বলেন, 'স্বনির্ভর দল করলে নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস হবে। টাকা জমবে ব্যাঙ্কে। সেই টাকার লোভে অন্তত আমরা ঘর ছেড়ে যাব না। আবার দলের সদস্যরা পাশে থাকবে। তারা গোলমাল মিটিয়ে দেবে। সংসারটা টিকে যাবে।'

ময়নার বাড়ি চাতাল ছেড়ে উঠে পড়ি। পাড়ার মাঝখানে বড়ো পুকুর। তার পাড় দিয়ে হাঁটছি। পাড়ার কোথাও ছিঁটে ফোটা মোরাম দেয়নি। 'যদি মোরাম দিত তবে বর্ষার সময় এক হাঁটু কাদা ঘাঁটতে হত না। কতবার আমাদের সদস্য উৎপল মার্জিতকে বললাম। কাজ হলনি। তবে কী করে? উনি তো পঞ্চায়েতের ভোটের পর আমাদের গাঁয়ে আসেননি।' সকল সরেন তাঁর ক্ষোভ উগরে দেয়। পঞ্চায়েত প্রধান কানাই ঘোষ বলেছেন, 'রতনপুরে যাওয়ার জন্য কোনো সরকারি রাস্তা নেই। ব্যক্তিগত জমি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। জমির মালিকরা জমি দিলে রাস্তা করে দেওয়া যাবে।' এক নেতা বললেন, 'বড়ো রাস্তার পাশে আদিবাসীদের জায়গা দিতে চাওয়া হয়েছিল। ওরা আসেনি। বলল বড়ো রাস্তার পাশে অনেক ঝামেলা।'

ঝামেলা তো এখানেও। সরকারি সব সুযোগ সুবিধা এঁরা পান না। অনেক কিছুই জানেনও না। জননী সুরক্ষা যোজনার কথাও অনেকে শোনেননি। তাই না পান প্রসবের আগে ভাতা, আর না পান হাসপাতালে প্রসবের সুযোগ।

সকল সরেনের স্ত্রী লক্ষ্মী সরেন ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন। পাড়ায় আর কেউ পাননি।

তিন জন বার্ধক্য ভাতা পান। সোম বিসরা, দাশু বিসরা, ময়নার মা বালেশ্বরী বিসরা।
খোলা আকাশ। তার তলায় উনুন জ্বলছে। পাড়ার ছোটোরা এখন সেই উনুনের চারদিকে বসে পড়ছে। পাশাপাশি অনেকগুলি উনুন। ছোটো ছোটো লণ্ঠন জ্বলছে। এক লণ্ঠনে অনেক স্বপ্ন। ময়না বলে, 'এখন আমাদের পাড়ায় পড়ার খুব চল।' 'কীভাবে হল?' 'অল ইন্ডিয়া সানতাল এডুকেশান কাউন্সিল থেকে অলচিকি শেখানোর ব্যবস্থা করেছে। কাছাকাছি একটা সেন্টার করেছে ওরা।' ময়না একথা বলার পর ফের যোগ করে, 'আসলে সাঁওতালি জাতি, ভাষা আমাদের আসল মা। বাংলা সতিন মা।' ততক্ষণে আমাদের সঙ্গী হয়েছে ময়নার মাধ্যমিক পাশ ভাই উকিল। সেই আজ কান্তি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে তার মাধ্যমিক পাশ যোগ করতে গেছিল। উকিল কথা বলায় পটু। আদব কায়দা অন্যরকম। কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমাদের সব থেকে বড়ো সমস্যা আদিবাসী সার্টিফিকেট পাওয়া। জাতির সার্টিফিকেট চাইতে গেলেই পাঁচ পুরুষের জমির কাগজপত্র চায়। জমি নেই তো, কাগজ পাব কোথা থেকে। অলচিকি শিখলে সার্টিফিকেট সহজে মিলবে। তাই অলচিকির সেন্টারগুলো ভালো চলছে।'

''সাঁওতালদের বড়ো বড়ো সংগঠন আছে। এখানে নেই?' জানতে চাই।

ময়না বলে, 'আমাদের লোকজন সংগঠন তৈরির বিষয়ে গেরাহ্য করে না। গ্রামে ফিকসান (দ্বন্দ্ব) আছে, কংগ্রেস সিপিএম -এর।'
চারদিক আঁধার নেমেছে। ঘন কালো। ঝাঁকড়া একটা বড়ো গাছ। তার তলায় টিমটিম করছে একটা আলো। সামনে তিনটে মৃত গোসাপ। পেট কাটা। এক বৃদ্ধ তার নাড়ি ভুঁড়ি কেটে বার করেছেন। উকিল বলেছেন, 'এর তেল নানারকম রোগ সারায়। দানে বিক্রি হবে। মাংসটা খাবে।' বৃদ্ধ কোনো কথা বলেন না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আদিবাসী পাড়ায় অনেক কথা শুনছি। মন যা চায়, তাই বলছেন ওঁরা। একসময় বলেছি, কোনো সমস্যার সমাধান কিন্তু আমরা করতে পারব না। আমাদের সে ক্ষমতা নেই। ময়না বলেছে, তাও কথা বলে মনটা তো হালকা হয়। এদিকে রাত্রি এসেছে। শেষ বেলায় ময়না বলেছে, 'আজ এখানে খেয়ে যান।' বলি 'অন্যদিন হবে।' রতনপুরকে বিদায় দিই। আল পথে ফিরছি। পঁয়ষট্টি বছরের পাড়ার মোড়ল সোম বিসরা খারাপ পথটার সাথী হয়েছেন। বলেছিলেন, 'নেতারা তাকায় না আমাদের। আমরা শুয়োরের মতো বাঁচি।'